বারো ভূতের গলপো

সুকুমার রুজ

পুনশ্চ

মুখবন্ধ

ভূত আছে কি নেই, এ তর্ক থাক। বাংলা সাহিত্য তথা বিশ্ব সাহিত্যে হাজার হাজার ভূতের গল্প আছে এবং লক্ষ লক্ষ ভূতের গল্পের পাঠকও আছে, এ কথা ভূতেরাও অস্বীকার করবে না। শুধু ছোটোরা নয়, বড়োরাও লুকিয়ে লুকিয়ে ভূতের গল্প পড়ে। কেউ কেউ ভয় পায়, কেউ আবার মজা পায়। খুব দুঃখ কষ্টের কাহিনি পড়ে যেমন কেউ চোখের জলে বুক ভাসায়। তেমনি কেউ ভূতের গল্প পড়ে ভূতের ভয়ে লোক হাসায়। নিন্দুকেরা বলে, রকেট-কম্পিউটারের যুগে ভূতের গল্প! রামো রামো! তারাই আবার ভূতের গল্প পড়ে রাতবিরেতে পথে একা যেতে যেতে বলে, 'রাম-রাম'। বিজ্ঞান পড়লেই যেমন সবাই বিজ্ঞানী হয়ে যায় না, তেমনি ভূতের গল্প পড়লেই যে ভীতুর ডিম হয়ে যাবে, এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। ডাকাতের গল্প পড়ে কি কেউ ডাকাত হয়ে যায়? পড়ে মজা পায়, তাই পড়ে। ভূতের গল্পও তাই। বাংলা-সাহিত্যে ভূতের গল্প লেখেননি, এমন সাহিত্যিক খুব কম আছেন। তাই বাংলা সাহিত্যের ভাঁড়ারে ভূতের গল্প খুব বেশি আছে। তবে সব ভূতের গল্পই যে 'গা -ছমছম করা' কিংবা 'ভয়াল-ভয়ঙ্কর' হতে হবে এমন কথা ব্রহ্মদত্যিই বিশ্বাস করে না। অদ্ভুত, বদ্‌ভূত, কিমভূত, নিমভূত, গেছোভূত, মেছোভূত, দুষ্টুভূত, মিষ্টিভূত, মজাদারভূত, হানাদারভূত, এরকম হরেক ভূতের কাণ্ড-কারখানা 'বারো ভূত'-এর পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে। পাঠকদের মনে ভয়, রোমাঞ্চ, শিহরন, এসবের মজা ছড়াতে পারলেই ভূতের গল্প লেখা সার্থক হবে বলে মনে হয়।

সূচিপত্র

আমবাগানের ভূত	....	১১
সত্যি ভূতের গল্প	....	২০
ভূত-পেতনির পুনর্বাসন	....	২৬
চুপনগরের রূপকথা	....	৩৩
লেখক-ভূত	....	৩৯
তেনাদের সংস্কৃতি	....	৪৬
আশ্চর্য চিঠি	....	৫১
শেষ দৃশ্যটা	....	৫৬
অলৌকিক	....	৬২
পাইন সিগন্যাল	....	৬৭
দাদুর সাইকেল	....	৭৩
ভূতুড়ে ফোন	....	৭৭

আমবাগানের ভূত

প্রিয় তপু ও গপু, কলকাতা থেকে রনি লিখছি।

আশা করি তোরা ভালো আছিস! তোদের অ্যানুয়াল পরীক্ষা নিশ্চয়ই হয়ে গেছে এতদিনে। আমার পরীক্ষা কম্‌প্লিট। নিশ্চয়ই জানিস, টনিদা এবার মাধ্যমিক দিল। কাল ওয়ার্ক এডুকেশন পরীক্ষা হয়ে গেলেই ও হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।

আমরা আগামী রবিবার সকালের গাড়িতে তোদের কাছে, মানে, আমাদের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাব। এক সপ্তাহ থাকব। তারপর আমাদের সঙ্গে তোরা এখানে, মানে, কলকাতায় বেড়াতে আসবি। এমনই কথা ছিল, মনে আছে তো! টনিদা বলেছে, গত বছর নাকি ভূত দেখাবি বলে দেখাতে পারিসনি। এবার ভূত-পেতনিগুলোকে সেজেগুজে তৈরি থাকতে বলিস্! এবার তেনারা দেখা না দিলে জানব ওঁরা নেই। তোরা বাজি হেরে যাবি। বাজির কথা মনে আছে তো! নাকি ভুলে মেরে দিয়েছিস?

ভালো কথা, দিনুদাকে নিয়ে তোরা যেন অবশ্যই স্টেশনে থাকিস। আমাদের সঙ্গে অনেক জিনিসপত্তর থাকবে।

কাকা-কাকিমা'কে প্রণাম জানাস। আর আমার নাম করে, পয়সা দিয়ে, নিতাইকাকার দোকান থেকে দু'জনে দুটো চকোলেট খেয়ে নিস্।

(যেহেতু তপুর চেয়ে এগারো দিনের বড়ো রনি)

চিঠিটা হাতে পেয়ে এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলে গোপন। ওর মনে খুশির হাওয়া। সকলের আগে দাদাকে চিঠির কথা জানাতে হবে। কালই দাদা বলছিল ওদের কথা। গত বছর দারুণ মজা হয়েছিল নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে। কাঁকড়ার তাড়া খেয়ে রনির কাদায় আছাড় খাওয়া। মৌমাছির চাকে ঢিল মেরে টনির শাঁক-আলু হয়ে যাওয়া। এসব কথা উঠতে সকলে হেসে লুটোপুটি। দাদা বলছিল, "এবার ওদের বোকা বানিয়ে, নাস্তানাবুদ করেই ছাড়ব।"

কিন্তু দাদা কোথায়? নিশ্চয়ই আমবাগানে গিয়ে বসে আছে!

গোপন এক ছুটে আমবাগানে। যা ভেবেছে ঠিক তাই! কুঁড়েঘরের পাশে বাঁশের চটানে বিপিনকাকা আর দাদা বসে আছে। বিপিনকাকা গলা ছেড়ে সেই 'খাঁচার

ভিতর অচিন পাখি' গানটা গাইছে। এই গানটাই রোজ গায় বিপিনকাকা। তবু কী ভালো যে লাগে এ গান শুনতে! কাকা বলে, এ লালন ফকিরের গান। আলমপুরের এক ফকিরের কাছে শিখেছে। দাদা আধখানা ব্লেড দিয়ে এক মনে কচি আমের খোসা ছাড়াচ্ছে।

গোপন চট্ করে পকেটে হাত দিয়ে দেখে নেয় ওর আধখানা ব্লেডটা ঠিকঠাক আছে কি না। কাল অনেক কান্ড করে দাদার কাছ থেকে ব্লেডটা বাগিয়েছে। দাদা তক্কে-তক্কে ছিল। ছোটোকাকু দাড়ি কামানোর পর বাতিল ব্লেড কখন ফেলেন! তারপর বহু কষ্টে দু'ভাইয়ে ভাগাভাগি। অন্য পকেটে হাত দিয়ে বোঝার চেষ্টা করে নস্যির ডিবের ঢাকনা খুলে গিয়ে, কালকের মতো নুন-লঙ্কা গুঁড়ো পকেটে পড়ে গেছে কি না! ঠাকুরদা'র নস্যির ডিবে। অনেক পুরোনো। ঢাকনির প্যাঁচ কাটা। দাদু মারা যাওয়ার পর কাঠের আলমারির কোণে পড়েছিল ডিবেটা। মায়ের কাছে ঘ্যানর-ঘ্যানর ক'রে কাল ওটা হাতিয়েছে নুন-লঙ্কা গুঁড়ো রাখার জন্য। আধখানা ব্লেড আর এই ডিবে থাকার জন্য বন্ধুদের কাছে যে ওর কদর বাড়বে, সে ব্যাপারে ও নিশ্চিত।

গোপন কী ভেবে চুপিচুপি দাদার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। শুকনো বটপাতার ওপর খোসা ছাড়ানো কচি আম। গোপু টুক্ করে এক টুকরো আম নিয়ে মুখে পুরে দেয়। তপু খপ্ করে ওর কান ধরে, "অ্যাই, নিলি কেন? কত কষ্ট করে ছাড়াচ্ছি।"

"আঃ! লাগছে, কান ছাড়। একটা ভালো খবর দোব। তাই পুরস্কারটা আগেই নিলাম।"

"কী খবর রে?"

গোপন চিঠিখানা দাদার চোখের সামনে মেলে ধরে, তপন চিঠি পড়ে বাঁশের চটান থেকে লাফিয়ে নামে, "দারুণ খবর এনেছিস! আমার সোনাভাই! নে, আম খা। জানিস, টনিদা খুব সাহস দেখায়। এবার আসুক না! জমিদারদিঘির জঙ্গলে গিয়ে ছেড়ে যাব। বাছাধন টের পাবে। ভূতে অবিশ্বাস!"

পকেট থেকে নুন-ঝালের ডিবে বের করে গোপু, "এই নে দাদা নুন-লঙ্কা গুঁড়ো। কাল পদ্মপিসিকে পটিয়ে পাটিয়ে গুঁড়িয়ে নিয়েছি।"

মনের আনন্দে দু'জনে কচ্‌মচ্ করে খেতে থাকে নুন-ঝাল দিয়ে কাঁচা আম। তপু চাকুমচুকুম্ শব্দ করে মুখে, "উঃ! খুব ঝাল! লঙ্কা বেশি হয়ে গেছে। মা'কে দেখিয়েছিস চিঠিটা?"

"না। পিয়নকাকু চিঠিখানা আমার হাতে দিতেই পড়ে নিয়ে সোজা তোর কাছে। কী টক রে আমগুলো! ল্যাংড়া বোধহয়! দাঁত আম্‌লে যাবে!"

"হ্যাঁ, ল্যাংড়া। কাঁচায় খুব টক!"

বিপিনকাকার গান থেমে গেছে। দু'ভাইয়ের কথায় কান ওর, "কিসের খপর গো কানাই-বলাই?"

"জ্যাঠার ছেলেরা এখানে আসছে। সাতদিন পর আমরাও ওদের সঙ্গে কলকাতা যাব। সেই যে রনি-টনিদা, মনে আছে?"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ। সেই যে ভূত-পেরেত, জিন-পরি-আজরাইন বিশ্বেস করে না, লম্বা-রোগা সাহেবরঙা ছেলেটা তো! ওঃ, ওদের নিয়ে কত কাণ্ড!"

"ঠিক ধরেছ!"

"ভালো, ভালো। ক'দিন হইহুল্লোড় হবে আর কী! ইশকুল খুলতে দেরি আচে তো!"

"হ্যাঁ, রেজাল্ট বেরোবে, তারপর ...! যাই কাকা! মা'কে চিঠির ব্যাপারটা জানাই।"

তপু-গপু গুটিগুটি এগোয় বাড়ির দিকে। গাছের ডালে বসে একটা কোকিল কু-কু করে ডাকছে। দু'জনে কোকিলের স্বর নকল করতে-করতে হাত ধরে হাঁটতে থাকে। কোকিলটা ডেকে চলে প্রাণপণে।

॥ ২ ॥

রবিবার। তপু, গোপু ও দিনুদা স্টেশনে এসে বসে আছে। কলকাতা থেকে আসার প্রথম গাড়ি ঢুকবে দশটায়। তবুও ওরা ন'টায় এসেছে। ট্রেনের সময় হতে একজন রেলকর্মী ঢং-ঢং করে ঘণ্টা বাজায়। টিকিট কাটার ঘণ্টা। ঢং-ঢং-ঢং, তিনটে শব্দ করে টিকিট-ঘন্টি থামলেও তপু গোপুর মনে ঘণ্টা বেজেই চলে নিঃশব্দে। আর-একটু পরেই ওরা এসে যাবে। কতদিন পর দেখা হবে, কথা হবে! গাড়িটা লেট করছে খুব!

ওই যে দেখা যাচ্ছে গাড়িটা। এখনও অনেকটা দূরে। এখনও গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে না। তবুও তপু-গোপু যেন শুনতে পাচ্ছে গাড়ির ঝিক্-ঝিক্। নাকি নিজের বুকের ধুক্‌পুক্! কে জানে!

দিনুদা বলে ওঠে, "দ্যাক, এ গাড়িতে আবার আসচে কি না! এটায় না এলে আবার ডেড়ঘণ্টা।"

দিনুদার কথায় তপু-গোপু অসন্তুষ্ট হয়। মুখে কিছু বলে না! তবে ওদের মনের মাঝে বাজতে থাকা একতারাটার সুর কেটে যায়।

গাড়ির সামনের দিকেই ওরা ছিল। জ্যাঠামশাই আসেননি। জেঠিমাকে প্রণাম করার পর তপন গোপন, টনি-রনিকে জড়িয়ে ধরে। টনি বলে, "অ্যাই, আমাকে প্রণাম করলি না! আমি তোদের চেয়ে বড়ো না! গুরুজনদের প্রণাম করতে হয়!"

তপন বলে ওঠে, "তুই গুরু নয়, লঘুজন হবি আমার চেয়ে। আমি পঞ্চাশ কেজি। তোর ওজন চল্লিশও হবে না মনে হয়। তা হলে কে গুরুজন?"

সবাই হো-হো করে হেসে ওঠে তপুর কথায়। দিনুদা ইতিমধ্যে ব্যাগট্যাগ কাঁধে তুলে নিয়েছে। সে বলে, "চলো বউমা।"

জেঠিমা বলেন, "হ্যাঁ, চলো দিনুদা! তুমি তো একইরকম আছ গো দিনুদা! মোটেই বুড়ো হওনি!"

"বুড়ো কী করে হব বলো তো! কেউ তো আমাকে কাকা-জ্যাঠা বা দাদু বলে না! কত্তাবাবু, মা, ছেলে, সকলেরই 'দিনুদা' আমি। তাই ... হেঁ-হেঁ-হেঁ। চলো বউমা, হেঁটেই চলো। এক দণ্ডএর পত, তাই গাড়ি আনিনি।"

বাড়ির পথে যেতে যেতে কত রকমের গল্প। বাগানের আমগাছগুলোতে আম ধরেছে কি না, বাগানের পাহারাদার সেই বিপিনকাকা কেমন আছে, সে অন্য গান শিখেছে, নাকি এখনও শুধু 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি' গায়। এমন হাজারও প্রশ্ন।

তপু-গোপু উত্তর দেওয়ার ফাঁকে-ফাঁকে জেনে নেয়, গত বছর বিড়লা মিউজিয়ামে একটা ডাইনোসর তৈরি হচ্ছিল, সেটা হয়ে গেছে কি না, কথা বলা রোবোট সেই 'খগেনবাবু' একাই আছে নাকি আর-একটা এসেছে?

এভাবে একে অপরের কৌতূহল মেটাতে মেটাতে ওরা বাড়ির কাছাকাছি। টনি বলে, "কী রে তপু! চিঠিতে আগাম খবর দিয়েছিলাম তোদের ভূতটুতগুলোকে রেডি থাকার জন্য। এবার ভূত দেখাবি তো? সেই যে বলিস, মাছ খেয়ে নেয়, লালপাড় শাড়ি পরে বসে থাকে! ওদের সঙ্গে এবার মোলাকাত করিয়ে দিস। তা না হলে মনে আছে তো বাজি ধরার কথা!"

তপুর মিনমিনে গলা, "কপালে থাকলে নিশ্চয়ই দেখতে পাবি। ওসব শখ করে কাউকে দেখানো যায় না। তোকে আগেও বলেছি, ওদের নিয়ে মজা করিস না। কী হতে কী হয়! ওদের গতিবিধি সর্বত্র।"

রনি-টনি হেসে ওঠে, "তাই নাকি! তোদের বাড়িতেও আসে তা হলে! তবে তো নিশ্চয়ই দেখা হয়ে যাবে। বাড়ি তো এসেই গেলাম।"

॥ ৩ ॥

নদীর ধারে গাঙশালিখের ছানা খুঁজতে যাওয়া। পুকুরে সাঁতার শিখতে গিয়ে রনির একপেট জল খেয়ে নেওয়া। ঢিল ছুঁড়ে আম পাড়তে গিয়ে ছোটোকাকুর কাছে কানমলা খাওয়া। এসব নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে তিনটে দিন কেটে যায়। এর মধ্যে আমবাগানেই কেটেছে বেশি সময়। বিপিনকাকার কাছে ওর ছেলেবেলার ভূতের

গল্প শোনা, তার সঙ্গে ওর সেই খাঁচা-পাখির গান তো আছেই। আজ ঠিক হয়েছে, বিকেলে যাবে জমিদারদিঘির জঙ্গলে। কিন্তু দুপুরেই আকাশ কালো করে মেঘ জমেছে। মা বললেন, "আজ কালবোশেখি হবে মনে হচ্ছে। এ বছরের প্রথম ঝড়। আজ তোরা কোথাও বেরোস্ না!"

রনি আকাশের দিকে তাকায়, "বাব্বা! একেবারে অন্ধকার হয়ে এল যে! কী রে গোপু! ভুতুড়ে ব্যাপার নাকি?"

টনি কাঁধ ঝাঁকায়, "ছাড় তো! ভূত না হাতি! তিনদিন হয়ে গেল ভূতের দেখা নেই। তপু-গপু, এরকম আঁধার-ঘেরা পরিবেশে একজন কাউকে ভূত সাজিয়ে দেখা অন্তত! নিজেদের সম্মানটা বাঁচা!"

গোপুর ফিসফিসে গলা, "দ্যাখ, ওসব নিয়ে মজা করিস না টনিদা! কখন যে ওরা দেওয়ালে কান পেতে রাখে ...!"

একটু পরেই শন্‌শন্ করে হাওয়া বইতে থাকে। গাছপালাগুলোতে লাগে দোলা। তপু- গোপুর মন চঞ্চল হয়ে ওঠে আমবাগানে যাওয়ার জন্য। ঝড়ে আম পড়বে। সঙ্গে-সঙ্গে না কুড়োলে অন্য ছেলেরা কুড়িয়ে নেবে। বিপিনকাকা একা কি সব কুড়োতে পারবে? বেশিরভাগ সময়ই তো ওকে বাগানের পশ্চিম দিকটায় পাহারা দিতে হয়।

মায়ের কাছে বাগানে যাওয়ার আরজি পেশ করা হয়। কিন্তু আরজি না-মঞ্জুর। ঝড়ের সময় বাগানে যাওয়া নিষেধ। কিন্তু তেমন ঝড় ওঠেনি। জোরে হাওয়া বইছে মাত্র। এই হাওয়াতেই তো কচি আমগুলো টুপ্‌টাপ্ পড়ে! ঝড় ওঠার আগেই ওরা বাগান থেকে ফিরে আসবে, এই অঙ্গীকার করে ওরা মা-জেঠিমাকে নিমরাজি করায়। চারজনে চারটে থলে হাতে নিয়ে ছুট্ লাগায় বাগানের দিকে। মা হাঁক পাড়েন, "তাড়াতাড়ি চলে আসবি। আর যদি বৃষ্টি নামে বিপিনের কুঁড়েঘরে থাকবি। ভিজিস্‌নে যেন! ঠান্ডা লাগবে।"

মায়ের কথাগুলো ওদের কানে যাওয়ার আগেই ওরা বাগানে পৌঁছে গেছে। বেশ অন্ধকার বাগানটা। যেন সন্ধে নেমে গেছে। শোঁ-শোঁ, কট্‌কট্ শব্দ। থোকা-থোকা আম- ওয়ালা ডালগুলো খুব জোরে জোরে দুলছে। নারকোল গাছগুলো এমন দুলছে যেন ভেঙে পড়বে! এত ধুলো উড়ছে যে, ভালো করে চোখ মেলা যাচ্ছে না। তার মধ্যেই ওরা আম কুড়োচ্ছে। চিৎকার করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। তা না হলে শুনতে পাচ্ছে না। বেশ কিছু আম কুড়িয়েছে। এমন সময় চড়বড়িয়ে বৃষ্টি নামে। মোটা-মোটা ফোঁটা। গোপু বলে, "দাদা বিষ্টি নামছে, বাড়ি চল।"

"দাঁড়া না! থলে ভরতি হয়নি এখনও। তা ছাড়া বিপিনকাকার সঙ্গেও তো দেখা হল না। সকালে গেলাম নদীর ধারে! চল, কুঁড়েতে ঢুকি গিয়ে! বৃষ্টি থামলে বাড়ি যাব।"